জেলা ব্র্যান্ডিং নেত্রকোণা

কর্ম-পরিকল্পনা

জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা

নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিং কর্ম-পরিকল্পনা

বৈচিত্র সংস্কৃতির শ্বেত পাহাড়ী ভূমি

১. ভূমিকা

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। এজন্য প্রয়োজন দ্রুত ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে পরিচিত অপরিচিত অনেক পর্যটক-আকর্ষক স্থান আছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে প্রত্মতাত্বিক নির্দশন, ঐতিহাসিক মসজিদ এবং মিনার, পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত, পাহাড়, অরণ্য ইত্যাদি অন্যতম। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলাকা বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত। বিনোদনের উৎস হিসেবে মানুষ যতগুলো মাধ্যম বেছে নেয় ভ্রমণ তার মধ্যে অন্যতম। আর ভ্রমণ পিপাসু মানুষের নিত্য চাহিদার উপর ভিত্তি করে পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠেছে হাজারো পর্যটন কেন্দ্র। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অবিরাম চেষ্টা চলছে। আর এই চিন্তা চেতনা থেকেই পর্যটন গড়ে উঠেছে শিল্প হিসেবে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে পর্যটকদের আগমন আজও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে পর্যটন শিল্প। নদী, হাওড় ও পাহাড়বেষ্টিত জেলা নেত্রকোণায় পর্যটন শিল্পের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। নেত্রকোণার অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পুরাকীর্তির প্রাচুর্য, অনবদ্য উপজাতীয় সংস্কৃতি এ জেলাকে ভ্রমণপিপাসুদের জন্য অসাধারণ সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। পথের দু'পাশে সবুজের প্রান্তর, কালো ধোঁয়ামুক্ত নীল আকাশ, বাতাসে ধানের ছড়ার ঢেউ খেলানো মন-মাতানো দৃশ্য নেত্রকোণাকে পর্যটন জেলা ব্র্যান্ডিংএর মাধ্যমে সবার কাছে পরিচিত করতে মূল্যবান ভূমিকা রাখবে যা নেত্রকোণা তথা সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

২. নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটক আকর্ষণ

- **নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস**

লোকশ্রুতি রয়েছে, নেত্রকোনা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মগরা নদীর বাঁকটি চোখের বা নেত্রের কোণের মতো বলে এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে 'নেত্রকোনা'। আবার কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, মগড়া ও কংশনদী পরিবেষ্টিত এলাকটি দেখতে অনেকটা চোখের মতো বা নেত্রের কোণসদৃশ বলেই এই রকম নামকরণ হয়েছে। তবে ধারণা করা হয় যে, নেত্রকোনা শব্দটি 'নাটোরকোণা' থেকেই হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস প্রাচীন ঐতিহ্যে টই-টুম্বুর ও ঐতিহ্যের বিচিত্র ঘটনা সম্ভারে গর্বিত। বিভিন্ন তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে যে সাগর বা সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠায় এ অঞ্চলটি মানব বসবাসের যোগ্য ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। গারো পাহাড়ের পাদদেশ লেহন করে এঁকেবেঁকে কংস, সোমেশ্বরী, গণেশ্বরী, মহেশ্বরী, গোরাউৎরা নদীসহ অন্যান্য শাখা নদী নিয়ে বর্তমান নেত্রকোণা জেলার জলধারার উদ্ভব। এ জেলার প্রত্যেক নদীই জেলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। ফলে সমগ্র জেলার ভূমি উত্তরাংশে উঁচু এবং ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বাংশে ঢালু। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন ছিল। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুরাজ শশাংকের আমন্ত্রণে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ যখন কামরূপ অঞ্চলে আসেন, তখন পর্যন্ত নারায়ণ বংশীয় ব্রাহ্মণ কুমার ভাস্কর বর্মণ কর্তৃক কামরূপ রাজ্য পরিচালিত ছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তরাংশে পাহার মুল্লুকে বৈশ্যগারো ও দুর্গাগারো তাদের মনগড়া রাজত্ব পরিচালনা করতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে জিতারা নামক জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী ভাটী অঞ্চল আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি নেত্রকোণা মহকুমাকে জেলা ঘোষণা করা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে নব প্রতিষ্ঠিত জেলার কার্যক্রম শুরু হয়।

- **ঐতিহাসিক স্থাপত্য**

নেত্রকোণা জেলায় অনেক প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে। সে সকল স্থাপত্যগুলো অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। কিছু স্থাপত্য এখনো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। নেত্রকোণার ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মদনপুরের হযরত শাহ্ সুলতান কমর উদ্দিন রুমি(র) মাজার, শাহ্ সুখূল আম্বিয়া মাজারের পাশে মোগল যুগের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, পুকুরিয়ার ধ্বংশপ্রাপ্ত দূর্গ, নেত্রকোণার ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের স্মৃতি চিহ্ন, দূর্গাপুর মাসকান্দা গ্রামের সুলতানি যুগের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ।

- **সুসলরাজ**

সুসলরাজ রঘুনাথ সিংহ মাধবপুর ছোট পাহাড়ের উপর একটি শিব মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। তবে মাধবপুরের সেই পাহাড়ে এখন পর্যন্ত অসংখ্য ভগ্নইট পাওয়া যায়। সুসল জমিদার বাড়ির শেষ অস্তিত্বও এখন বিলীন। ষোড়শ শতাব্দির প্রথম ভাগে সুসল রাজ জানকি নাথ মল্লিক এক বিশাল পুকুর খনন করেছিলেন। সে পুকুর স্থানীয় ভাবে কমলারাণী দীঘি নামে খ্যাত। একটি মাত্র পাড় ছাড়া কমলারাণীর দীঘির আর কোন চিহ্ন নেই। কালে ভরাট হয়ে গেছে। সুসল রাজ পরিবারের প্রথম পুরুষ সুমেস্বর পাঠক একটি দশভূজা মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সে মন্দিরটি কোথায় নির্মিত হয়েছিল তা এখন আর কেউ বলতে পারেন না।

- **পূর্বধলার জমিদার বাড়ি ও পাগল পন্থি**

পূর্বধলার জমিদার বাড়ির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বেই। ঘাগড়া জমিদার বাড়ির প্রাচীন ইমারত গুলো ও বাঘবেড় এবং নারায়নদহ জমিদার বাড়ির ইমারতগুলো প্রায় বিলুপ্ত। সোনাইকান্দা, লেটিরকান্দা ও একই থানার লালচাপুর গ্রামের মোঘল যুগের মসজিদ গুলো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচুলিয়া গ্রামের সুলতানি যুগের মসজিদ ও আগল সরকারের আক্রার মন্দিরটি ৭১ পরবর্তি কালে বিলুপ্ত হয়েছে। লেটিরকান্দা গ্রামে পাগল পন্থিদের পারিবারিক কবর রয়েছে। সে কবরস্থানে পাগল পন্থিকরণ শাহ্, টিপু শাহ্, ছপাতি শাহ্ সহ তাঁদের বংশের অন্যান্যদের কবর রয়েছে। সে কবরস্থানের প্রাচীরটি বৃটিশ শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল, যা এখনো দাঁড়িছে আছে ।

- **সাত পুকুর ও হাসানকুলী খাঁর সমাধি**

আটপাড়া থানার রামেশ্বরপুর ও সালকি গ্রামে সাতটি পুকুর রয়েছে। বিশাল এ পুকুরগুলো অতি প্রাচীনকালে খনন করা বলে মনে হয়। বড় পুকুরের পশ্চিম পাশে হাসানকুলী খাঁর সমাধি। সে সমাধিটি কালো শিলা দিয়ে বাঁধানো। হাসানকুলী খাঁ ছিলেন একজন পুঁথি লেখক। তার পুঁথির সুত্র ধরে বিচার করলে এ পুকুর ও সমাধিটি মোঘলযুগের বলে ধরে নিতে হয়। এ ছাড়া শুনই গ্রামের প্রাচীন দূর্গ এখন বিলুপ্ত।

- **রোয়াইল বাড়ির প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন**

কেন্দুয়া থানার ঐতিহাসিক স্থাপত্যের রোয়াইল বাড়ির প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন অন্যতম। ১৯৯২ খৃস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কতৃক রোয়াইল বাড়িতে খনন কাজ পরিচালিত হলে বেরিয়ে আসে মসজিদ, দূর্গ, রাস্তা, পরিখা, কবরস্থান ও অনেক অট্টালিকা। তারমধ্যে বারোদুয়ারী ঢিবির দক্ষিণাংশে সমতল ভূমি। খননে আরো পাওয়া গেছে কারুকার্যময় অট্টালিকার চিহ্ন ও দূর্গে সৈনিকদের কুচকাওয়াজের প্রসস্ত মাঠ। ঐ প্রাচীন চিহ্নবহ স্থানটির আয়তন ৮ হেক্টর। এটি আয়তকার ছিল বলে ধারনা করা হয়। দক্ষিণে বেতাই নদীর তীর ঘেঁষে ভাঙ্গন অথবা নোঙ্গারঘাটের জন্য দেয়াল গাঁথুনি ছিল। মূল দুর্গের দৈঘ্য ৪৫০ মিটার ও প্রস্থ ১৫৭ মিটার। ইটের পরিমাণ ৩৭১৮৬ সেন্টিমিটার। সন্মুখভাগে জোড়াদিঘি। এর একটির দৈঘ্য ২৭০ মিটার ও প্রস্থ ৭০ মিটার, অপরটির দৈঘ্য ১৫০ মিটার ও প্রস্থ ৯০ মিটার। খননে বেরিয়ে আসা মসজিদটির কারুকাজ ও ইটের আকৃতি সুলতানী আমলের। সংস্কার ও কারুকাজ সংযোজন হয়েছিল মুঘল যুগে। একই থানার জাফরপুর গ্রামে একটি মসজিদের ইটের নকশা ও কারুকাজে রোয়াইল বাড়ির মসজিদের ইট ও কারুকাজের সঙ্গে মিল রয়েছে। মনে হয় এ দুটি মসজিদ একই সময়ে প্রাতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নোয়াপাড়া গ্রামের জমিদার ও আশুলিয়া গ্রামের অনেক প্রাচীন স্থাপত্য আজ বিলুপ্ত।

- **প্রাচীন নিদর্শন**

মদন থানার ফতেপুর ও জাহাঙ্গীরপুরের দেওয়ানদের বাতিঘরের অস্তিত্ব এখন আর নেই। চাঁনগাও গ্রামে ১টি প্রচীন মসজিদ রয়েছে। ধারনা করা হয় মসজিদটি মোঘল যুগে নির্মিত হয়েছিল। জেলার মোঘল যুগে নির্মিত অন্যান্য মসজিদের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া মদন সদরে শাহ্ সুফি সাধক সৈয়দ আহম্মদ বসরির মাজার শরীফ। বারহাট্রা থানার পিরিজপুর গ্রামে প্রাচীন জোড়া পুকুর। এর মধ্যে বড় পুকুরটি ৬ শতাংশ ও ছোট পুকুরটি ২ শতাংশ ভূমি নিয়ে গঠিত। প্রাচীন পাট্রা ইটের গাথুনীতে পুকুরের ঘাট বাঁধানো ছিল। তার ধ্বংসপ্রাপ্তের চিহ্ন এখনো পরিলক্ষিত হয়। বাড়ির নাম কোর্টবাড়ি, বাজার এখন না থাকলেও স্থানের নাম দেওয়ানের বাজার। সে এলাকায় ভগ্ন ইটের ছড়াছড়ি রয়েছে। বাড়ি নির্মাণের পরিবেশ এখনো চমৎকার। আমঘোয়াইল গ্রামের দক্ষিণের সাউথপুরে একটি ভাঙ্গা ইমারত রয়েছে। যা ৩৬০ বর্গফুট। এ ইমারতটি অতি প্রাচীন তা সহজেই অনুমিত হয়। সিংদা গ্রামে একটি প্রাচীন দেব মন্দির ছিল। মন্দিরটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বারহাট্রা বাজারের মন্দিরটিও অতি প্রাচীন তা সহজেই অনুমিত হয়।

মোহনগঞ্জের সেখের বাড়ির মসজিদটি সুলতানি আমলে নির্মিত। মাঘান গ্রামে মোঘল যুগের আরো একটি মসজিদ রয়েছে। দৌলতপুর গ্রমে ৮৭৬ বঙ্গাব্দে নির্মিত পাশাপাশি দুটি মন্দির আছে। সেথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতগুলো এখন তার শেষ চিহ্নও ধরে রাখতে পারেনি।

- **<u>পর্যটক আকর্ষণ স্থানসমূহ</u>**

১. সাদামাটির পাহাড়

রাশমণি স্মৃতিসৌধ থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে বিজয়পুরে আছে সাদামাটির পাহাড়। এখান থেকে চীনা মাটি সংগ্রহের ফলে পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে ছোট ছোট পুকুরের মতো গভীর জলাধার। পাহাড়ের গায়ে স্বচ্ছ জলাধারগুলো দেখতে চমৎকার।

২. বিরিশিরি কালচারাল একাডেমী

বিরিশিরি কালচারাল একাডেমিতে উপজাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করা হয়। এখানে প্রতি বছর উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর জনসমাগম হয়।

৩. টংক শহীদ স্মৃতি সৌধ

১৯৪৬-৫০ সালে কমরেড মনি সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত টঙ্ক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ। আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমি থেকে কিছুটা সামনে শোমেশ্বরী নদী পার হয়ে কিছু দূর এগুলেই চোখে পড়বে এ স্মৃতিসৌধটি। বর্ষা মৌসুমে শোমেশ্বরী জলে পূর্ণ থাকলেও শীত মৌসুমে নদীটি পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বর কমরেড মনি সিংহের মৃত্যু দিবসে এখানে তিন দিন ব্যাপী মনি মেলা নামে লোকজ মেলা বসে।

৪.রোয়াইলবাড়ি দুর্গ

বাংলার প্রাচীন শাসনকর্তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যমন্ডিত এক ঐতিহাসিক স্থান। একসময় কত ঘটনাই না ঘটেছে এ দূর্গে। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ, নছরত শাহ এবং ঈশা খাঁ'র অশ্বারোহী বাহিনীর ঠক ঠক শব্দে কিভাবেই না কেঁপেছে এই রোয়াইলবাড়ির মাটি; সে ইতিহাস আজ পুরোপুরি জানা না গেলেও তাঁদের অহংকার ও শৌর্য-বীর্যের সাক্ষী হয়ে আজো ঠাঁয় দাড়িয়ে আছে প্রাচীন দূর্গটি।

৫. সুসং দুর্গাপুরের জমিদার বাড়ি

জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় অবস্থিত সুসং দুর্গাপুরের জমিদার বাড়ি। সুসং দুর্গাপুরের সোমেশ্বর পঠকের বংশধররা এ বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। বাংলা ১৩০৪ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে জমিদার বাড়িটি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের বংশধররা এটি পুনর্নির্মাণ করেন। এ জমিদার বাড়িটি চারটি অংশে বিভক্ত। বড় বাড়ি, মেজ বাড়ি, আবু বাড়ি ও দুই আনি বাড়ি। জানা যায় ১২৮০ মতান্তরে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের কোনো এক সময়ে কামরূপ কামাখ্যা থেকে শোমেশ্বর পাঠক নামে এক ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে ভ্রমণে আসেন। এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে থেকে যাবার পরিকল্পনা করেন। শোমেশ্বর পাঠক গারো রাজা বৈশ্যকে পরাজিত ও নিহত করে রাজ্য দখল করে নেন। সে সময়ে সুসং রাজ্যের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল আদিবাসী, যাদের অধিকাংশই আবার গারো। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর তার বংশধররা এ অঞ্চলে জমিদারি করে।

৬. রানীখং মিশন

বিরিসিরি থেকে শোমেশ্বরী নদী পার হয়ে রিকশায় রানীখং গ্রাম। এখানে আছে সাধু যোসেফের ধর্মপল্লি। রানীখং গ্রামের এ ক্যাথলিক গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২ সালে।

৭.রাশমণি স্মৃতিসৌধ

রানীখং থেকে বিজয়পুর পাহাড়ে যাবার পথে বহেরাতলীতে আছে হাজং মাতা রাশমনি স্মৃতিসৌধ। ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সংঘটিত কৃষক ও টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম শহীদ ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের নেত্রী হাজং মাতা রাশমণির স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাশমণি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এখানে নির্মাণ করেছে রাশমণি স্মৃতিসৌধ।

৮.নেত্রকোনার হাওর

জেলার মোহনগঞ্জ, মদন, খালিয়াজুড়ি, কলমাকান্দায় কম বেশি ৫৬ টি হাওর ও বিল আছে। শুস্ক মৌসুমে হাওরে চাষাবাদ হলেও বর্ষা মৌসুমে পানিতে পরিপূর্ণ থাকে। তখন এসব এলাকার একমাত্র বাহন হয় নৌকা। মোহনগঞ্জ শহর থেকে রিকশায় দিকলাকোনা গিয়ে এখানকার ডিঙ্গাপোতা হাওরে প্রবেশ করা যায়। এখান থেকে ইঞ্জিন নৌকায় করে হাওরের বিভিন্ন গ্রামে যাওয়া যায়। বর্ষাকালে হাওরের গ্রামগুলো একেকটি ছোট দ্বীপের মতো মনে হয়।

৯.সোমেশ্বরী নদী

এই নদীটি একটি কয়লা খনি। মেঘালয়ের গারো পাহাড় থেকে নেমে এসেছে এই সোমেশ্বরী নদী যার আদি নাম ছিলো ‘সমসাঙ্গ’। বিজয়পুর, রানী খং এসব জায়গায় যেতে হলে এই নদী নৌকায় পাড় হতে হয়।

১০.ঐতিহাসিক সাত শহীদের মাজার

১৯৭১ সনের ২৬ জুলাই মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নাজিরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংলগ্ন তিন রাস্তার মিলনস্থলে পাক বাহিনীর সাথে বন্ধুক যুদ্ধে ০৭ (সাত) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাগণের মরদেহ লেঙ্গুরা ইউনিয়নের ফুলবাড়ি নামক স্থানে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। উক্ত সমাধি সাত শহীদের মাজার নামে পরিচিত।

১১.কমলা রাণী দিঘী

বিরিশিরি ইউনিয়ন পরিষদের পাশেই কমলা রাণী দিঘী। এই কমলা রাণী দিঘী সাগর দিঘি নামেও পরিচিত। দিঘীটি পুরোপুরি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও এর দক্ষিণ পশ্চিম পাড় এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে।

১২.সাদা মাটি

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদ থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কুল্লাগড়া ইউনিয়নের আড়াপাড়া ও মাইজপাড়া মৌজায় বিজয়পুরের *সাদা মাটি* অবস্থিত। বাংলাদেশের মধ্যে প্রকৃতির সম্পদ হিসেবে সাদা মাটির অন্যতম বৃহৎ খনিজ অঞ্চল এটি।

১৩.সিলিকা বালি

দুর্গাপুর উপজেলায় রয়েছে উন্নতমানের সিলিকা বালি, যা সোমেশ্বরী নদী থেকে উত্তোলন করা হয়। প্রতিবছর এ নদী থেকে প্রতি মাসে ৯,০০০ ট্রাক সিলিকা বালি উত্তোলন করা হয় যা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সিলিকা বালি অবকাঠামোগত কর্মকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্থায়ী করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৪.বিখ্যাত বালিশ মিষ্টি

বালিশ মিষ্টির জনক গোয়ানাথ ঘোষাল। হিন্দুদের মধ্যে ঘোষ পরিবার মিষ্টি তৈরিতে বিখ্যাত। নেত্রকোনা শহরের বারহাট্টা রোডের 'গয়ানাথ মিষ্টান্ন ভান্ডার'-এর স্বত্বাধিকারী গয়ানাথ ঘোষ শত বছরেরও বেশি সময় আগে বালিশ মিষ্টি উদ্ভাবন করেন। গোয়ানাথের স্বপ্ন ছিল নতুন কোন ধরনের মিষ্টি আবিষ্কার করে অমর হয়ে থাকা। একদিন তিনি বিশাল সাইজের একটি মিষ্টি তৈরি করলেন এবং ক্রেতাদের খেতে দিলেন এবং ক্রেতারা খুব প্রশংসা করলো। এর আকার অনেকটা কোল বালিশের মতো (টাঙ্গাইলের চমচমের মতো)। তাই ক্রেতাদের পরামর্শে মিষ্টিটির নাম রাখেন বালিশ। এ অঞ্চলে বালিশ মিষ্টির ঐতিহ্য নিয়ে প্রচলিত বহু ছড়া যুগ যুগ ধরে চলছে আমজনতার মুখে মুখে। বালিশ নিয়ে এমন একটি লোকজ ছড়া হল- ‘‘জাম, রসগোল্লা পেয়ে শ্বশুর করলেন চটে নালিশ,আশা ছিল আনবে জামাই গয়ানাথের বালিশ”।

১৫.স্বাদু পানির মাছ (পাবদা)

পাবদা *মাছ* একটি বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ। এই মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু এবং জনপ্রিয়। নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় এই মাছটি পাওয়া যায়। নেত্রকোনা সদর উপজেলার লক্ষীগঞ্জে মাছের চাষ করা হয়।

১৬.মহাশোল মাছ

মহাশোলের জন্ম ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাদদেশে নেত্রকোনা জেলার সীমান্তবর্তী সুসং দুর্গাপুর গারো পাহাড়ের খাদে। প্রাকৃতিক নিয়মেই পাহাড়ি খাদে জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা ওই মাছের বৈশিষ্ট্য হলেও সেখানে আহরণ সম্ভব নয়। ভরা বর্ষায় প্রবল বর্ষণ ও স্রোতের টানে ১০০-১৫০ ফুট পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়ে মহাশোল। পাহাড়ের খাদ থেকে পড়ে মুক্ত জলরাশিতে মনের আনন্দে উল্কার গতিতে ছুটতে গিয়ে সোমেশ্বরী নদীতে জেলেদের পেতে রাখা জালে ধরা পড়ে মহাশোল। তাও আবার এই বর্ষা মৌসুমে। প্রবল বর্ষণ ও ঢলের মাত্রা বেশি হলে মহাশোল ধরা পড়ার সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পায়। পুরো বর্ষা মৌসুমে জেলেদের জালে সাধারণত ১০-১৫টি মহাশোল ধরা পড়ে। মাছটির গায়ের রঙ চকচকে উজ্জ্বল সোনালি বর্ণের হয়ে থাকে। মাছটি খাদ্য হিসেবে নুড়িপাথর ও শেওলা খেয়ে সেখানেই পরিপুষ্ট হয়। মাছটি ওজনে ১৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মহাশোলের সোনালি আচলা আকারে বড় ও পুর হওয়ায় তা দিয়ে পাখা, কুলাসহ বিভিন্ন শৌখিন দ্রব্য বানানো হয়।

৩. জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য

নেত্রকোণা জেলার সম্ভাবনাসমূহকে সবার সামনে তুলে ধরে জেলার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল উদ্দেশ্য। নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- নেত্রকোণা জেলায় পর্যটন শিল্পকে উৎসাহিতকরণ ও এর উন্নয়ন ঘটানো;
- নেত্রকোণা জেলায় বাংলাদেশে পর্যটনের উপযোগী অবকাঠামো সৃষ্টি করা;
- নেত্রকোণা জেলাকে, পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সকল ধরণের কার্যাবলীতে সংযুক্ত রাখা;
- জেলার অর্থনীতিকে সম্বৃদ্ধ করা;
- জেলার ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ;
- জেলার অনবদ্য উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কৃষ্টির লালন ও বিকাশ;
- পর্যটন শিল্পের বিকাশে জেলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসম্পদ তৈরী করা;
- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সবার সামনে তুলে ধরা;
- সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা;

৪. জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয়

পর্যটনের জন্য সরকারি অনুদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি উন্নত অবকাঠামো, সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা দরকার। নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুরের সাদামাটির পাহাড় এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে ঘিরে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে পর্যটনকে নেত্রকোণার জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

৫. পর্যটনকে নেত্রকোণার জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা

উপজাতীয় সংস্কৃতি, পাহাড়, হাওর ও প্রাচীন নিদর্শনের এক বিপুল সম্ভাবনাময় স্থান নেত্রকোণা। এ জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুরের সাদামাটির পাহাড়কে পুঁজি করে গড়ে উঠতে পারে শক্তিশালী জনসম্পদ। নেত্রকোণা জেলায় সাদামাটিকে ঘিরে পর্যটনকে ব্র্যান্ড করার কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

- **সাদামাটির বৈশিষ্ট্যঃ**

১. সাদামাটি প্রাকৃতিক সম্পদ।

২. কালো, ধূসর এবং লাল মাটি।

৩. সাদামাটি তিন প্রকার। যথাঃ-

- গ্রেড এ – উৎকৃষ্ট মানের মাটি।
- গ্রেড বি – মধ্যম মানের মাটি।
- গ্রেড সি – নিম্ন মানের মাটি।

৪. কেওলিন বা অ্যালুমিনিয়াম সম্বৃদ্ধ।

৫. প্রতি ক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন।

৬. মাটিতে বিভিন্ন খনিজ উপস্থিত।

৭. মাটিতে সিলিকা বালি রয়েছে।

৮. সাধারণত মসৃণ, কিন্তু ভেজা অবস্থায় আঠালো ও নরম এবং শুকনা অবস্থায় মধ্যম মাত্রায় শক্ত ও ভঙ্গুর।

৯. মূল উপাদান কেয়োলিনাইট ছাড়াও কিছু পরিমাণ কোয়ার্টজ (২০% থেকে ৩০%), ইলাইট ও সামান্য ক্লোরাইট রয়েছে।

১০. এই সাদামাটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫৫।

১১. সাদামাটির রাসায়নিক ফলাফল হলোঃ

সিলিকন অক্সাইড	৫০% থেকে ৬৮%
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	২০% থেকে ৩৩%
আয়রন অক্সাইড	০.৪% থেকে ২.৮%
টাইটানিয়াম অক্সাইড	০.৪% থেকে ২%
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	চিহ্নমাত্র থেকে ০.৮%

- **অনন্য বৈশিষ্ট্য :**

✓ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সাদামাটির চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের।

✓ বর্তমানে এ মাটি টাইলস, সিরামিক, তৈজসপত্র ও গ্লাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাবহার হচ্ছে।

নেত্রকোণার আদি সংস্কৃতিঃ উত্তরে গারো পাহাড়, পশ্চিমে সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বে সুরমা-ধনুর মিলিত ধারার বড় গাঙ এবং দক্ষিণে মেঘনা নদীর জলধারা বেষ্টিত মহুয়া-মলুয়ার দেশ পূর্ব ময়মনসিংহ। এই পূর্ব ময়মনসিংহের বিশাল বিস্তৃত ভূ-ভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ নেত্রকোণা জেলা। চতুর্দশ শতকের সুসং রাজ্য, প্রাচীন কালের কামরূপের খালিয়াজুরি রাজ্য বা ভাটির দেশ এবং মদনপুর কোচ রাজ্যের সমন্বয়ে নেত্রকোণার বিকাশ। নেত্রকোণা অঞ্চলে কখন কিভাবে জনবসতি গড়ে উঠে তার সঠিক ইতিহাস অজ্ঞাত। তবুও বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় মহাভারতের কালে ময়মনসিংহ জেলাসহ বঙ্গদেশে তিন চতুর্থাংশ ব্রহ্মপুত্র নদ বা লোহিত সাগরের গর্ভে লুকায়িত ছিল। গ্রীকদুত মেগেস্থিনিসের ভ্রমন কাহিনী 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থের বর্ণনামতে সেই সময় পূর্ববঙ্গ সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়ে কামরূপের অন্তর্ভূক্ত হয়। সে সময় পশু পালন ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। পশু পালন, শিকার, ফলমূল সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে অত্রাঞ্চলের প্রাচীন জনগোষ্ঠী কৃষি কর্মে অভ্যস্থ হয়। জীবন জীবিকার কর্ম প্রবাহের উপর প্রকৃতির বৈচিত্র্যতার প্রভাব পরস্পরকে একীভূত করে গড়ে তোলে এক নবতর সামাজিক মূল্যবোধ। উদার-উদাস প্রকৃতি, শান্ত নীরব বনরাজী, মৃদুমন্দ হাওয়া, ফুটে থাকা বনফুল, বিল-ঝিলের পদ্ম, নদীর কল কল ধ্বনি, পাখির কলরব, পাহাড়ের পাদদেশে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত প্রাচীন জনগোষ্ঠীর

হৃদয়ে প্রকৃতির অমোঘ নিয়েমে এনে দেয় সুর ও ছন্দ। ফলে সমাজ চেতনা মানবিক মূল্যবোধের রসে হয়ে যায় টইটুম্বর। সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে লোকসমাজে ভাষা, আচার-আচারণসহ লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।
নিম্নে নেত্রকোণা প্রেক্ষিত কতিপয় লোকঐতিহ্যের প্রাসঙ্গিক বিবরণ তুলে ধরা হল:

হামুড় : হামুড় হলো ঐ অঞ্চলের যৌথ চাষাবাদ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। এ পদ্ধতিতে কয়েকজন চাষির একত্রে চাসাবাদ কার্য বোঝায়।
হাংড়া : হাংড়া পদ্ধতির কৃষিকর্ম নেত্রকোণার এক গুরুত্বপূর্ণ লোকঐতিহ্য। নেত্রকোণার আঞ্চলিক উচ্চারণে হাংড়া বলতে ধানরোয়া, ধান কাটা, পাটক্ষেতে কাজ করা, জমিতে নিড়ানী, ইত্যাকার কর্ম যৌথভাবে সম্পন্ন করা বুঝায়।
বাঁকড়ি : বাঁকড়ি নেত্রকোণার একটি আঞ্চলিক শব্দ। বাঁকড়ি পদ্ধতি মূলত পশুপালনে রাখালদের মধ্যে চালু ছিল।
দাঅইন : দাঅইন নেত্রকোনার একটি আঞ্চলিক শব্দ। পশুপালনে এই দাঅইন ব্যবহৃত হয়। গোয়াল ঘরে গরু মুখমুখি সারিবদ্ধভাবে বেঁধে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।
মাড়া : মাড়া নেত্রকোণার কৃষি কর্মে ব্যবহৃত একটি আঞ্চলিক শব্দ। গোলচক্কর করে পাকা ধানের মুটি বা মুইট সাজিয়ে ধানের মাড়া তৈরী করা হয়।
বেঢ়: বেঢ় নেত্রকোণা তথা পূর্ব ময়মনসিংহের একটি বহুল ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ। বেঢ় বলতে চতুর্দিকে বেষ্টিত করা বুঝায়। আদিকাল থেকে বন্য হিংস্র জানোয়ার মারার কাজে বেঢ় ব্যবহার করা হত।
পাল : এ অঞ্চলের একটি আঞ্চলিক শব্দ। গরুর পাল বা গবাদি পশুকে পাল করে মাঠে চড়ানো হয়।
পালান : কার্তিক অগ্রহায়ন মাসে বর্ষার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নেত্রকোনা তথা পূর্ব ময়মনসিংহের হাওরাঞ্চলে পালান কাটার হিড়িক পড়ে যায়। পালান হল লাকড়ি বা জ্বালানির জন্য ব্যবহার যোগ্য ছোট ছোট লতা জাতীয় বৃক্ষের প্রকৃত বাগান।
চাঙ্গাড়ি : মাটি কেটে চাঙ্গাড়ি করে দুজনে মিলে বহন করে নেত্রকোণার লোক ঐতিহ্য।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতিঃ

এ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সত্ত্বাগুলো এ দেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক ভান্ডারেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। একই সংগে জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছে আরো বর্ণিল, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ। দুর্গাপুরের প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে গারো সম্প্রদায়। গারোদের প্রধান উৎসব ‘ওয়ানগালা’ যা ‘নবান্ন’ উৎসব নামেও পরিচিত। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হাজংদের প্রধান উৎসবের মধ্যে রয়েছে ‘দেউলী উৎসব’। এছাড়াও রয়েছে কোচ সম্প্রদায় যাদের প্রধান উৎসব ‘বিহু উৎসব’।

৬. লোগো ও ট্যাগলাইন

৭. নেত্রকোণা জেলার পর্যটন শিল্পের বর্তমান অবস্থা

নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুরস্থ সাদামাটির পাহাড়, রানীখং মিশনের রয়েছে পর্যটন শিল্প হিসেবে বিকশিত হওয়ার অপার সম্ভাবনা। প্রতি বছর এ অঞ্চলে কয়েক হাজার পর্যটকের আগমন ঘটে। দুর্গাপুরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে পর্যটকের সংখ্যা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। দুর্গাপুরে পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা নেই; এছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক হওয়ায় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বিপুল সমাহার থাকা স্বত্ত্বেও পর্যটকদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারছে না। আবাসন ও যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হলে দুর্গাপুরকে পর্যটকসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা যাবে, যা এর অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা পালন করবে।

৮. কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

পর্যটনকে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবেঃ

- পর্যটকদের বার্ষিক আগমনের হার ৫০% বৃদ্ধি করা।
- বছরে ২০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- পর্যটনের স্থানীয় প্রবৃদ্ধি ৫০% বৃদ্ধি।
- পর্যটনশিল্পকে প্রসারের লক্ষ্যে নেত্রকোণায় দক্ষ ও সম্বৃদ্ধ জনসম্পদ তৈরী।

৯. নেত্রকোণায় পর্যটনশিল্পের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ

সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে নেত্রকোণা জেলায় পর্যটনশিল্পের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হলোঃ

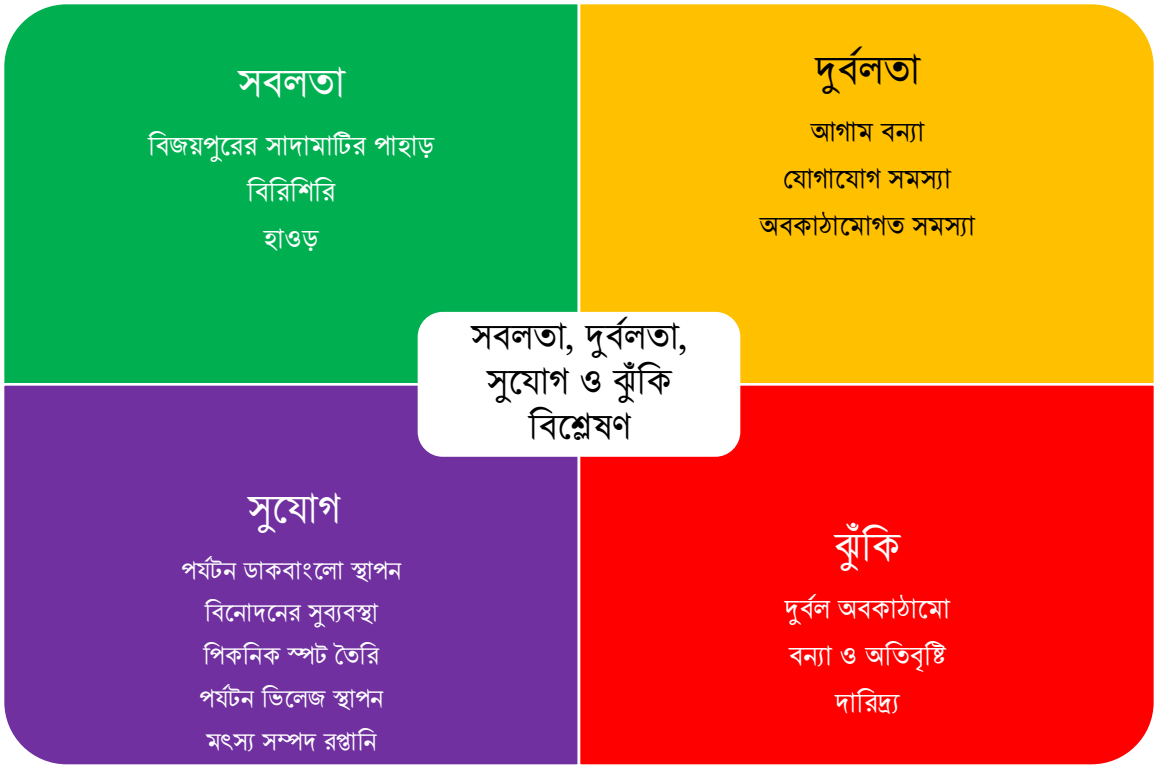

ক. সবলতা

- **বিজয়পুরের সাদামাটির পাহাড়ঃ** বিজয়পুরের মূল আকর্ষণ সাদামাটির পাহাড় হলেও এখানে নীল পানির জলাশয় দেখা যায়। অনেক উঁচু উঁচু টারশিয়ারী পাহাড়ে সমৃদ্ধ বিজয়পুর। পাহাড়ের পাদদেশে বিভিন্ন রহস্যময় গুহাও চোখে পড়ে। সীমান্তফাঁড়ির পাশে পাহাড়ে ওঠার ব্যবস্থা রয়েছে ; এখান থেকে সোমেশ্বরী নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।
- **বিরিশিরিঃ** বিরিশিরি কালচারাল একাডেমিতে উপজাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করা হয়। এখানে প্রতি বছর উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর জনসমাগম হয়।
- **হাওড়ঃ** সাগরসদৃশ বিস্তৃত জলরাশির প্রান্তর হাওর। অনেকের ধারণা, সাগর শব্দ থেকেই হাওর শব্দটি এসেছে। এছাড়া হাওর অঞ্চলকে ভাটি অঞ্চলও বলা হয়। এ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি জেলায় প্রায় ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার হাওরাঞ্চল রয়েছে। এর মধ্যে নেত্রকোনা অন্যতম। এ জেলায় ছোট-বড় অসংখ্য হাওর রয়েছে। এ হাওরগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। শুষ্ক মৌসুমে সবুজের সমারোহ আর বর্ষায় জলকেলির খেলা, যা ভ্রমণপিপাসুদের বিমোহিত করে।

খ. দুর্বলতা

- **আগাম বন্যাঃ** নেত্রকোণার আগাম বন্যা সমগ্র দেশের অর্থনীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। প্রতি বছরের এ বন্যা নেত্রকোণার কৃষি ও মৎস্য সম্পদে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগের কারণ ঘটায়।
- **যোগাযোগ সমস্যাঃ** নেত্রকোণা জেলায় পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ থাকে দুর্গাপুরের বিরিশিরি। কিন্তু দুর্গাপুর ভ্রমণ পটকদের মনে বাধ সাধে যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থার জন্য।
- **অবকাঠামোগত সমস্যাঃ** পর্যটনদের জন্য নেত্রকোণার প্রধান অন্তরায় এ জেলার অবকাঠামোগত দুর্বলতা। পর্যটক স্পটগুলোয় আবাসনের সমস্যা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও স্যানিটেশনের অভাব, গাড়ি রাখার স্থানের অপ্রতুলতা, বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের দুরব্যবস্থা ইত্যাদি হলো এ জেলার প্রধান প্রধান দুর্বলতা।

গ. সুযোগ

- **পর্যটন ডাকবাংলো স্থাপনঃ** নেত্রকোণার আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটগুলোতে বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন পর্যটন ডাকবাংলোর ব্যবস্থা করা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন পর্যটক এ জেলা ভ্রমণে উৎসাহী হবে, অপরদিকে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে।
- **বিনোদনের সুব্যবস্থাঃ** বিনোদনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- হাওড় ইকোপার্ক, শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা, বাহারি ফুলের উদ্যান, পাহাড়ে ক্যাবল কার ও প্যারাস্যুটিংসহ বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টি করা যায়।
- **পিকনিক স্পট তৈরিঃ** নেত্রকোণার সকল পর্যটক স্পটগুলোতে সল্প উদ্যোগে ছোট ছোট বিভিন্ন পিকনিক স্পট তৈরি করা যায়।
- **পর্যটন ভিলেজ স্থাপনঃ** পর্যটন ডাকবাংলো, বিভিন্ন বিনোদনের সুবিধা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যটক গাইডসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পর্যটন ভিলেজ স্থাপন করা যায়।
- **মৎস্য সম্পদ রপ্তানিঃ** নেত্রকোণার হাওড়ের বিশাল জলরাশি প্রাকৃতিকভাবেই মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ। এ মৎস্য সম্পদ দেশে মাছের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করলে দেশের অর্থনীতি আরও দৃঢ় হবে।

ঘ. ঝুঁকি

- **দুর্বল অবকাঠামোঃ** নেত্রকোণার উন্নয়নের জন্য অবশ্যই নেত্রকোণাবাসীকে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ জেলার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন করার সবচেয়ে বড় কারণ এর দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- **বন্যা ও অতিবৃষ্টিঃ** বন্যা ও অতিবৃষ্টি নেত্রকোণা জেলার কৃষি সম্পদ ও মৎস্য সম্পদের বিপুল ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে জেলার জনগণের জীবনমানে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বন্যার দুরবস্থার কারণেও এ জেলা অন্যান্য

মানুষের মনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া করে।

- **দারিদ্রতাঃ** এ জেলার বেশিরভাগ জনসাধারণ নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে অসচেতন থাকে। ফলে অসচেতনতার কারণে তারা তাদের পুরানো অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে পারেনা। ফলে যারা দরিদ্র তারা আরও দরিদ্র রয়ে যাচ্ছে, যা এ জেলার জনগণকে সকলের সামনে দরিদ্র হিসেবে পরিচিত করছে।

১০. জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে সম্পৃক্তকরণ

পর্যটন ছাড়াও নেত্রকোণা জেলায় রয়েছে এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাদামাটি, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রসিদ্ধ খাবার বালিশ মিষ্টি, বিখ্যাত মহাশোল মাছ ও পাবদা মাছ।

১১. জেলা ব্র্যান্ডিং কর্ম-পরিকল্পনা

জেলা ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়নের জন্য তিন বছর মেয়াদী নিম্নোক্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ করা হবেঃ

স্বল্পমেয়াদঃ ০৬ মাস
মধ্যমেয়াদঃ ০১ বছর ০৬ মাস
দীর্ঘমেয়াদঃ ০৩ মাস

কর্ম-পরিকল্পনা ছক

নং	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি	সময়সীমা	সহায়তাকারী
১	ব্র্যান্ডিং এর বিষয় নির্দিষ্টকরণ	বিষয় নির্ধারিত	সংশ্লিষ্ট কমিটি	ইতোমধ্যে নির্ধারিত	জেলার সকল অংশীদার
২	একজন জেলা ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠন	ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও কমিটি গঠন	জেলাকমিটি	মে-২০১৭	জেলার সকল অংশীদার
৩	কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্ধারণ	কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্ধারিত	সংশ্লিষ্ট কমিটি	মে-২০১৭	জেলার সকল অংশীদার
৪	ব্র্যান্ডিং লোগো ও ট্যাগলাইন নির্ধারণ	নির্ধারিত	সংশ্লিষ্ট কমিটি	এপ্রিল-২০১৭	জেলার সকল অংশীদার
৫	পর্যটনের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ	প্রতিবেদন	সংশ্লিষ্ট কমিটি	এপ্রিল-২০১৭	জেলার সকল অংশীদার
৬	পর্যটনকে ব্র্যান্ড করার ক্ষেত্রে শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	চিহ্নিত করা হয়েছে	সংশ্লিষ্ট কমিটি	মে-২০১৭	জেলার সকল অংশীদার
৭	সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন	পরিকল্পনা প্রণীত	সংশ্লিষ্ট কমিটি	মে-২০১৭	জেলার সকল অংশীদার

৮	ব্র্যান্ড বুক প্রণয়ন	ব্র্যান্ড বুক প্রণয়নের কার্যক্রম চলিত	সংশ্লিষ্ট কমিটি	জুন-২০১৭	জেলা কমিটি
৯	প্রচার	প্রচারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহিত	সংশ্লিষ্ট কমিটি	চলমান	স্থানীয় মিডিয়া, তথ্য মন্ত্রণালয়
১০	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান	সংশ্লিষ্ট কমিটি ও উপকমিটি	চলমান	জেলার সকল স্তরের জনগণ
১১	বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিবীক্ষণ	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি কার্যক্রম চলমান	সংশ্লিষ্ট কমিটি ও উপকমিটি	প্রতিবছর	জেলা কমিটি

১২. প্রচার

সার্বিক দায়িত্ব বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত প্রচার কমিটির না

প্রচারের মাধ্যম	সময়সীমা	দায়িত্ব
প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম	চলমান	সংশ্লিষ্ট কমিটি
ব্যানার ও বিলবোর্ড স্থাপন	জুলাই ২০১৭	সংশ্লিষ্ট কমিটি
স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং প্রচার	চলমান	সংশ্লিষ্ট কমিটি
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা	চলমান	সংশ্লিষ্ট কমিটি
জেলা ব্র্যান্ডিং উৎসব ও মেলার আয়োজন	জুলাই ২০১৭	সংশ্লিষ্ট কমিটি
জেলা ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ওয়েব পেজ তৈরি যা জেলা তথ্য বাতায়নে থাকবে	মে ২০১৭	সংশ্লিষ্ট কমিটি
বিভিন্ন লিফলেট ও সুভ্যেনির তৈরি ও বিতরণ	আগস্ট ২০১৭	সংশ্লিষ্ট কমিটি

১৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি

সার্বিক দায়িত্ব বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত জেলা ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়ন কমিটির নামঃ

জেলা ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়ন কমিটিঃ

জেলা প্রশাসক	সভাপতি
পুলিশ সুপার	সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
সিভিল সার্জন	সদস্য
সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য

উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
পৌরসভা মেয়র (সকল)	সদস্য
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
জেলা ব্র্যান্ডিং কাজে অভিজ্ঞ একজন সহকারী কমিশনার	সদস্য
জেলা তথ্য অফিসার	সদস্য
উপমহাব্যবস্থাপক, বিসিক	সদস্য
জেলা কালচারাল অফিসার	সদস্য
জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	সদস্য
সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
সভাপতি, হোটেল মালিক সমিতি	সদস্য
সভাপতি, সড়ক পরিবহণ মালিক গ্রুপ	সদস্য
স্থানীয় নারী নেত্রী/ব্যবসায়ী	সদস্য
স্থানীয় যুব সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
সভাপতি/গোত্র প্রধান সংশ্লিষ্ট নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	সদস্য
জেলা প্রশাসক কতৃক মনোনীত গণ্যমান্য ব্যক্তি (২ জন)	সদস্য
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য-সচিব

১৫. জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের সমস্যা, সম্ভাবনা, সংকট ও উত্তরনের উপায়

নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের সমস্যাসমূহঃ

১. এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ নেই।
২. দূর্বল যোগাযোগ অবকাঠামো।
৩. ভালো মানের হোটেল ও সেবা দুটোই এখানে দূষ্প্রাপ্য। শহরকেন্দ্রিক কিছু সেবা থাকলেই পর্যটন এলাকাগুলোতে এসব সেবা
৪. পর্যটন স্থাপনা যেমনঃ হোটেল, মোটেলের সংখ্যা অত্যধিক কম।

নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের সম্ভাবনাঃ

১. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি এই জেলা।
২. এখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু খুবই আরামপ্রদ।
৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এদেশকে প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে আলাদা করেছে।
৪. এ জেলার মানুষ অতিথিপরায়ন।
৫. এ জেলার রয়েছে পুরনো সমৃদ্ধ ও খুব সুন্দর লোকসাহিত্য সম্ভার, এসব কিছু সঠিকভাবে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবি।
৬. এ জেলার রয়েছে নান্দনিক লোকশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেগুলো পর্যটক আকর্ষণের বিষয় হতে পারে।
৭. উপজাতীয় স্বতন্ত্র্য ক্রীড়া, ভাষা, সাহিত্য, প্রাচীণ নির্দশন সমূহ আকর্ষণের বিষয় হতে পারে।

নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের সংকটঃ

১. আমাদের যেকোনে বিষয়ে উত্তরণে মূল সংকট হলো পরিবর্তনের মানসিকতার অভাব।
২. কোনো প্রাকৃতিক সুন্দর ভেন্যুকে আমরা সাজিয়ে আরো সুন্দর পর্যটন বান্ধব করতে পারিনি।
৩. নেতিবাচক ভাবমূর্তি পরিবর্তন করতে পারিনি।
৪. ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক হোটেল মোটেল আছে। কিন্তু পর্যটকের জন্য হোটেল ব্যবস্থা অপ্রতুল।

নেত্রকোণা জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের সংকট উত্তরণের উপায়ঃ

১. পর্যটন বান্ধব যোগাযোগ ও স্থাপনা তৈরী করতে হবে।
২. সরকারি বেসরকারি ভাবে দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।
৩. পর্যটন এলাকাগুলোর সমস্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, ভেন্যুগুলো নিরাপদ করতে হবে।
৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারীভাবে গাইড স্বেচ্চাসেবক ও খন্ডকালীন কর্মী তৈরী করতে হবে।
৬. সারাবছর নানা ইভেন্ট আয়োজনের , যেমন আমাদের লোকগান, লোকখেলা, লোকনাচ ইত্যাদি থাকতে পারে। আদিবাসি উপজাতির নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া ও প্রদর্শণী। সারা বছর নানা ক্রীড়া সাস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হতে পারে পর্যটন শহরে।

১৬. উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতকে শক্তিশালী করার জন্য পর্যটন শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নেত্রকোণা জেলায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের পথের বাধাগুলোকে দূর করে একে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার। এ শিল্পের বিকাশ শুধু অর্থনৈতিক লাভের জন্যই নয় বরং জেলার ভাবমূর্তির বিষয়টিও এর সাথে জড়িত। উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলে দৃঢ় অর্থনীতি অর্জনের অন্যতম একটি খাত হিসেবে পর্যটনকে প্রতিষ্ঠা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।